একক ১৮ ❐ পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব

গঠন

১৮.১ প্রস্তাবনা
১৮.২ ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি
১৮.৩ নব্য ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার
১৮.৪ রোমান্টিক সমালোচনা
১৮.৫ বস্তুবাদী সমালোচনা
১৮.৬ অববয়বাদী সাহিত্যবিচার পদ্ধতি
১৮.৭ অনুশীলনী
১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ প্রস্তাবনা

যে কাঠ জ্বলে নি তা যেমন আগুন নয়, যে মানুষ কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেন নি তিনি কবি নন ; তেমনি যে পাঠকের হৃদয় সাহিত্যপাঠের ফলে বাঙ্ময় প্রকাশ রূপ লাভ করে নি তিনি সমালোচক ন'ন। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূত-সভার সভাধিপতির ('আমি') মুখ দিয়ে বলেছিলেন, কাব্য থেকে কেউ ইতিহাস সন্ধান করতে পারেন, কাব্য থেকে কেউ দর্শন উৎপাটন করতে পারেন, কাব্য থেকে কেউ হয়ত শুধুই কাব্য খুঁজে পেতে পারেন, যিনি যা পেলেন তাতেই তাঁর সন্তুষ্টি—বিবাদে ফল নেই, বিবাদের আবশ্যিকতাও নেই। স্রষ্টার মতো সমালোচক ও স্বয়ম্ভর—আপন জগতের অধীশ্বর আপনি-ই। এই বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের ভালো-মন্দ বিচার বোধের চেয়ে ভালো-লাগা মন্দ লাগার প্রকাশকেই দিয়েছিলেন সমধিক গুরুত্ব। ওয়াল্টার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন এই মতাদর্শের প্রচারক। এই মতবাদীদের একটি বিশেষ প্রবণতা আসে কান্তিবাদের দিকে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের দিকে অতিরিক্ত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় কান্তিবাদী তথা কলাকৈবল্যবাদীদের মধ্যে ; করণ তাঁরা শিল্পের সার্থকতা শিল্প ছাড়া অন্যত্র সন্ধান করেন না। সুতরাং এই শিল্পীর ও তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত সমাঝদার তিনিই হতে পারেন যিনি নিজেও একজন দক্ষ কারিগর। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা কবিকে 'কারায়িত্রী' এবং সমালোচককে 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভার অধিকারী মনে করতেন। অপূর্ব্বস্তু নির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা-র অধিকারী সাহিত্যকই শুধু প্রতিভাবান নন, যিনি সাহিত্যকে আস্বাদ করেছেন সেই সহৃদয় সামাজিকেরও প্রতিভা আছে, তবে তা সৃজনধর্মী নয়। পুনঃ পুনঃ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসে যে সাহিত্যরসিকের মধ্যে এসেছে তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, তিনিই শুধু 'সহৃদয়' পদবাচ্য এবং তার প্রতিভা হল 'ভাবয়িত্রী' গোত্রের। স্রষ্টার মানসিকতার কিছুটা সমালোচকের থাকা উচিত। এই প্রতিভা বলেই তিনি স্রষ্টার না বলা বাণীকেও উপলব্ধি করে নেন। সাহিত্য বিচারের পথ তৈরি করা বা সে পথ দিয়ে ওপরের যাওয়ার সময় দুপাশের সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ হতে থাকে, কিন্তু সৌন্দর্যে মগ্ন হওয়ার অধিকার থাকে না। নিছক আনন্দ-

সম্ভোগ সমালোচকের জন্য নয়। আপন আনন্দটা তাঁকে অপরের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সাহিত্যবিচারের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিকে সমর্থন জানায়। কারণ Analytical পদ্ধতিও একটি পদ্ধতি। রূপবাদী বা Formalist যাঁরা তাঁরা তো কাব্যাস্বাদ করেন শব্দ, ছন্দ, অলংকার সব কিছুকে টুকরো করে। শৈলী বিচারকদের মেনেছেন অনেকে। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, অবয়বগত বিচারই কি শেষ কথা? এই শেষকথাটি কেউই বলতে পারেন না। নতুবা রূপবাদীদের মতো মার্কসবাদীরাও যথেষ্ট নবীন এবং চিন্তার দিক থেকে বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে সন্ধান করার মতো ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন দেখে এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও-সে-তুং চিন্তিত হয়ে কাব্য-সাহিত্যের নিজস্ব একটা দাবিকে স্বীকার করেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

বস্তুত পাশ্চাত্যে এই সমালোচনার ধারা শুরু হয়েছিল ক্লাসিক্যাল রীতিকে সামনে রেখে। তারপর ক্রমে রোমান্টিক, ঐতিহাসক, মার্কসীয়, শৈলী—নানান পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। মোটকথা সমালোচকের প্রথম কাব্যগুণ হল, সাহিত্যকে সরাসরি স্পর্শ করা, সে যে পদ্ধতিকেই তিনি অবলম্বন করুন না কেন। সাহিত্যিকের সঙ্গে সমালোচকের সাক্ষাৎ মধ্যপথে। কারণ সাহিত্যিক যাত্রা করেন ভাব থেকে রূপে, আর সমালোচক যাত্রা করেন রূপ থেকে ভাবে। সাক্ষাৎ মুহূর্তে সাহিত্যিকের কাছ থেকে রূপ-রসের যে মশালটি এক কালের সমালোচক নিজের হাতে নিয়ে নিলেন সেই মশালটি তিনি পৌঁছিয়ে দিলেন আগামী যাত্রার পথিকের কাছে। রসতীর্থ পথে কাল থেকে কালান্তরে পাঠকের যাত্রা চলল এইভাবে।

রোমান্টিক সমালোচনা

'রোমান্স' শব্দটি প্রভাঁস (ইতালি-র) অঞ্চলের প্রেমের কবিতার সঙ্গে যুক্ত। ক্রবেয়ারগণ প্রভাঁসের ভাষায় যেসব কবিতা লিখতেন সে সবই ছিল রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। উত্তরকালে শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নারীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের কবিতা এবং নানারকম চমৎকারিত্বমূলক কবিতা। আমরা পার্থেনন-এর মধ্যে যেমন খুঁজে পেয়েছি আদর্শ তেমনি রোমান্টিক আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় গোথিক ক্যাথিড্রাল-এ। কোনো অখণ্ড সীমারেখার দ্বারা তা তৈরি নয়, দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিকতা এর ধর্ম নয়। তৃতীয়তঃ ভিতরের অংশটি আলো-ছায়ার মাঝারিতে রহস্যময়। প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্য শিল্পের পার্থক্য এইখানে যে, রোমান্টিক শিল্প-অতিপ্রাকৃত সত্য, সীমাহীন রহস্য এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অসীমতার দিকে উন্মুখ। রোমান্টিকদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণ-আততায়ীদের প্রতি উন্মুখতা বর্তমান থাকে। ক্রবেয়াররা যে রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লিখতেন তা-ও ছিল অতীন্দ্রিয়, সীমাহীন প্রেমের কবিতা। ক্লাসিকাল রচনার বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়মতন্ত্রের অধীন, রোমান্টিকদের বৈশিষ্ট্য তেমনি নিয়মের বন্ধনকে অস্বীকার করা। রোমান্টিকেরা সাধারণভাবে কোনো নিয়মের দাসত্ব করতে না চাইলেও কল্পনার স্বৈরাচারকে মেনে নেন সর্বত্র। তাইতো নব্য-ধ্রুপদী সমালোচকদের প্রকরণসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ তাঁর লিরিক্যাল ব্যালাড্স্-এর মুখবন্ধে। যদিও ক্লাসিক, নব্য ক্লাসিক বা রোমান্টিক সব শিল্পীকেই মূলত কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয় তথাপি ক্লাসিকদের সঙ্গে রোমান্টিকদের পার্থক্য এইখানে যে প্রথম দল কল্পনাকে কাব্যের বাহ্যউপাদান রূপে গণ্য করতেন এবং যার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক নেই ও যা অপ্রাসঙ্গিক তাকে বর্জনীয় জ্ঞান করতেন। রোমান্টিকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়বেদতা। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু গ্রিকেরা তাকে ভাবাবেগের স্তরে উন্নীত করেননি। ক্লাসিসিষ্টদের কাছে সত্য ছিল বহিরঙ্গো এবং এই সত্য সর্বজনীন। অপরপক্ষে রোমান্টিকেরা মনে করতেন সত্য রয়েছে বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে।

রোমান্টিকেরা তাঁদের রচনার প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন এই সমস্ত উপাদান থেকে ঃ—

ক. মধ্যযুগীয় মানসিকতা তথা গোথিকের পুনর্জাগরণ ঃ অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকদের কাছে গোথিক ছিল বর্বরতা। মধ্যযুগ হচ্ছে অন্ধকার। কিন্তু রোমান্টিকেরা গোথিকের মধ্যে খুঁজে পেলেন উচ্চাশা ও আনন্দের প্রতীক। রহস্য, আধ্যত্মিকতা ও উল্লাস ছিল রোমান্টিকদের কাছে মধ্যযুগের স্বরূপ। মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে কাব্যবাহিনীকে স্থাপন করেছিলেন রোমান্টিকেরা ; কোলরিজের ক্রিস্টাবেল, স্কটের আখ্যানকাব্য, কীটসের 'The Eve of St. Agnes', মধ্যযুগীয় বাতাবরণে রোমান্টিক রহস্য বা প্রেমের কাব্য।

খ. গোথিক রোমান্সের কাহিনী রোমান্টিকদের প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল।

গ. প্রাচীন ব্যালাডের নবাবিষ্কার দেখা দিল। কোলরিজ ও কীটস এর দুটি রচনা এই প্রসঙ্গো স্মরণ করা যায়—The Rime of the Ancient Mariner (coleridge), La Belle Dame Sans Merci (Keats)

ঘ. অতিপ্রাকৃতের পরিমণ্ডল রচনা 'ব্যালাড' কর্মের ব্যবহার।

ঙ. পরিচিতকে অতিক্রম করে নতুন ভূগোলের সন্ধান। অনিশ্চিতের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার কবিতা 'The Rime of the Ancient Mariver' ।

চ. নিসর্গ-নগর ও নাগরিক সংস্কৃতির কৃত্রিম পরিমণ্ডলে থেকে বন-নদী-পাহাড় পর্বতের অন্ধ আদিম জীবনে উপস্থিত হওয়া।

ছ. অলীক স্বপ্নের জগৎ - অপূর্ণ বর্তমান থেকে অজ্ঞাত - অপরিচিত পরিবেশ মানুষের পূর্ণতা সন্ধানের জন্য অলীকের দিকে যাত্রা। শেলীর - 'Prometheus Unbound'

জ. রাজনৈতিক মুক্তি সন্ধান-ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ারূপে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী কাব্যে রূপ নিতে থাকে।

প্রাচীন গ্রিক-নাটকে রীতিগত বাস্তবতা ছিল না, ছিল বিষয়বস্তুর বাস্তবত। মধ্যযুগীয় রোমান্সে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ছিল না, ছিল রূপ-রীতির বাস্তবতা। কিন্তু আমরা বাস্তবতা-প্রধান রচনা বলে প্রাচীন বা মধ্যযুগের কোনো সৃষ্টিকে গ্রহণ করিনা। বাস্তবজগতের ওপর একদা রচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হোমর-শেক্সপীয়র-প্রমুখ, আবার উনিশ শতকে স্তাঁদাল-বালজাক-ফ্লোব্যার, পুশকিন-তলস্তয়-শেকভ, ডিকেন্স-হেনরি জেমস সেই বাস্তব জগতের উপাদান এবং সমস্যাই তাঁদের গল্প উপন্যাস-নাটকে ব্যবহার করেছেন। তবে সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বলতে যদি আমরা বুঝি বস্তু জগৎ থেকে আহৃত উপাদানের যথাযথ ব্যবহার তাহলে সেই বাস্তবতা যেমন হোমারে ছিল না, তেমনি নেই হেনরি-জেমস্ এও। প্রাত্যক্ষিক সত্যের যথাযথ রূপায়ণকে সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে সম্মত নন কোনো শিল্পী বা অলংকারিকই। অথচ 'বাস্তব' বলতে আমরা বুঝি সেই সত্য যা চোখে দেখি বা ধরতে ছুঁতে পারি। কিন্তু সেই অর্থে সাহিত্য কোনোদিনই 'বাস্তব' নয়।

সাহিত্য হল ভাষা দিয়ে গঠিত ভাবের রূপ। ভাবের রূপ প্রকাশ পেতে পারে সুরে, রঙে-রেখায়। তাহলে প্রাপ্ত রূপকে নাম দেব গান বা ছবি এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য .... ইত্যাদি। সুতরাং 'সাহিত্য' নামক শিল্পকর্ম যে একটি বিশিষ্ট অভিধা-চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তার কারণ তার বাণী। ভাববাদীরা এই বাণী বা উক্তির মধ্যে সন্ধান করেন অনির্বচনীয় মাধুরী। বচনকে অতিক্রম করে এই যে অনির্বচনীয়তার মাধুর্য সন্ধান তারই ফলে কাব্যবিচার একসময় পরিণত হয় Interpretation-এ। লেখক যা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি পাঠককে দিয়ে বলিয়ে নিতে চান—এই হচ্ছে এই ধরনের ব্যাখ্যাতাদের মৌলিক প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের বিচার হল সাহিত্যের ব্যাখ্যা ; সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ সমালোচককে লেখা ও লেখকের মধ্যবর্তী দূত মাত্র ভাবতেন, যার একমাত্র কাঝ পাঠককে বুঝতে সাহায্য করা। তিনি বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বাণী মাধ্যম শিল্প যে সাহিত্য তাকে কি করে ধরা যাবে প্রথমেই। যদি না বাণী বিন্যাসের তাৎপর্য ধরা যায় ? যে কৌশলে কোনো কবি-লেখক বাণী বা শব্দসমূহ সজ্জিত করেন সেই কৌশল বা তাঁর আপনার ব্যাপার ; সুতরাং সাহিত্য হল ভাষা দিয়ে গঠিত ভাবের রূপ। ভাবের রূপ প্রকাশ পেতে পারে, সুরে, রঙে-রেখায়। তাহলে প্রাপ্ত রূপ-কে নামদের গান বা ছবি এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ..... ইত্যাদি। সুতরাং 'সাহিত্য' নামক শিল্পকর্ম যে একটি বিশিষ্ট অভিধা-চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তার কারণ তার বাণী। ভাববাদীরা এই বাণী বা উক্তির মধ্যে সন্ধান করেন অনির্বচনীয় মাধুরী। বচনকে অতিক্রম করে এই যে অনির্বচনীয়তার মাধুর্য সন্ধান তারই ফলে কাব্যবিচার একসময় পরিণত হয়। লেখক যা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি পাঠককে দিয়ে বলিয়ে নিতে চান-এই হচ্ছে ধরনের ব্যাখ্যাতাদের মৌলিক প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের বিচার হল সাহিত্যের ব্যাখ্যা ; সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ সমালোচককে লেখা ও লেখকের মধ্যবর্তী দূত মাত্র ভাবতেন, যার একমাত্র কাজ পাঠককে বুঝতে সাহায্য করা। তিনি বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বাণী মাধ্যম শিল্প যে সাহিত্য তাকে কি করে ধরা যাবে প্রথমেই। যদি না বাণী বিন্যাসের তাৎপর্য ধরা যায় ? যে কৌশলে কোনো কবি-লেখক বাণী বা শব্দসমূহ সজ্জিত করেন সেই কৌশল বা তাঁর আপনার ব্যাপার ; সেখানে তাঁর ষ্টাইল' ধরা পড়ে, আর বিশেষে ষ্টাইলে তিনি 'কর্ম' দাঁড় করলেন সেখানে ধরা পড়ে তাঁর গঠন পরিপাট্য অবয়ব-বিন্যাসের কৌশল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য বিচারকেরা এ থেকে থাকেন নি, তুষ্ট থাকেন নি সাধারণ বা মার্কসীয় পন্থায় সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানের মধ্যে। তাঁর সাহিত্যের বিচারে এনে ফেলতে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও নৈব্যক্তিকতা। নিঃসন্দেহে কঠিনকাজ। যে পদ্ধতিতে একটা ব্যাঙ বা গিনিপিগ-কে টুক্‌রো করে ল্যাবরেটরি-তে বিশ্লেষণ করা যায়, সাহিত্যে সেই পদ্ধতি ব্যবহার আদৌ সম্ভব বা সংগত ? কিন্তু এই চেষ্টাই করলেন পাশ্চাত্ত্যের Explication মতবাদীরা, শৈলী বিজ্ঞানীরা (slylistics তত্ত্ব) এবং অবয়ববাদীরা (structuralist রা)।

১৮.২ ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি

সাহিত্যবিচারের শ্রেষ্ঠ উপায় কী ? সাহিত্যবিচারের শেষ কথা কে বলবেন ? নিঃসন্দেহে দুটি প্রশ্নের উত্তরেই নীরব থাকতে হয়। সাহিত্যবিচারের যেমন কোনো রাজপথ নেই, তেমনি শেষ কথাও কিছু নেই। এক্ষেত্রেও 'যত

মত তত পথ'। তবে যিনি যে পথেই অগ্রসর হোন, যে কোনো মতাদর্শকেই শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে হবে এক জায়গায়। এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্বত্রই একই সত্য চোখে পড়ে। তাই ভারতের পর ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট, অ্যারিস্টটল, হোরেস, লঙ্জাহিনাস, সিডনি, বার্ক, লেসিং, কান্ট, হেগেল, মার্কস থেকে আরও অনেকে এসেছেন ও আসছেন। তবে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ধারা থেমে গিয়েছ কয়েক শতাব্দী আগে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য বিচারের ধারা আজও নানা চেহারায় অব্যাহত। আমরা বাংলায় যে-সব সাহিত্যবিচার পদ্ধতি ব্যবহার করি তা পাশ্চাত্ত্য মতাদর্শের কাছ থেকেই সংগৃহীত। একালে জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় উত্তরাধিকারের অবিনাশী অহংকারে লাভ নেই। ঐতিহ্যসূত্রে কিছু কিছু শব্দ এবং ধারণা (concept) একালেও হয়তো আমরা বহন করে চলেছি ; কিন্তু অবশ্যই পুরোনো শব্দের আভিধানিক অর্থতাৎপর্য একালে আর চলে না। আমাদের প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রের রীতিকে পাশ্চাত্ত্যের পরিভাষায় বলা যায়। কিন্তু ওদেশের মতো আমাদের সাহিত্যে Neoclassical আন্দোলন আসেনি। Romantic আন্দোলন যা এসেছে তা উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। পাশ্চাত্যের প্রভাবই সেক্ষেত্রে মুখ্য।

Classical শব্দটি বিশেষণ। মোটামুটি তিনটি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে ঃ

১। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের ভাষা, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতির যা কিছু প্রাচীন তাই ক্লাসিকাল।

২। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নাটক, মহাকাব্য - প্রভৃতি যা কিছু গ্রিক ও রোমান শিল্পের অনুকরণে সৃষ্ট হয় তাকেই বলা হয় ক্লাসিকাল অথবা নব্য-ক্লাসিকাল।

৩। যে শিল্পকর্ম গ্রিক ভাবাদর্শ বা মেজাজ (Spirit) অনুকরণ করেছে তাই ক্লাসিক। বিশেষ 'classic' এবং বিশেষণ 'classical' আরও বিভিন্ন অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সেরা রচনা বলতে বুঝি ক্লাসিক। এ অর্থে হোমারের মহাকাব্য, শেক্সপীয়রের নাটক, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো ভালো রচনা, সবই ক্লাসিক। যখন এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন লাতিন 'classicus' কথাটাই মনে থাকে, যার অর্থ 'highest Mark' বা উচ্চ মানের। এই অর্থে ভালোজাতের রোমান্টিক রচনাকেও ক্লাসিক বলা যেতে পারে। যেমন ঃ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক, 'গোরা' উপন্যাস, 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ক্লাসিক বলে গণ্য হতে পারে। ক্লাসিকাল মিউজিক (ধ্রুপদী সংগীত) কথাটায় যে ক্লাসিক শব্দটা পাচ্ছি তা দু'রকমের অর্থ মনে আসে। এক অর্থে বুঝি, ধ্রুপদী সংগীত হল সেই সংগীত যার সঙ্গে রোমান্টিক মেজাজের গানের পার্থক্য আছে। অন্য অর্থে বুঝি, ক্লাসিকাল মিউজিক হল 'high class' মিউজিক।

যাই হোক, আমাদের প্রথমেই স্মরণে রাখতে হবে যে রেনেশাঁসের সময় থেকে শব্দটির জন্ম। শব্দটির জন্ম দুটি লাতিন শব্দের মিশ্রণ থেকে। একটি হল ক্লাসিকাস যার অর্থ উচ্চশ্রেণি এবং অপরটি ক্লাসিস, যার অর্থ হল 'at school' বা স্কুলের শ্রেণিতে। আসলে মনে করা হত যে গ্রিক এবং লাতিনেই প্রথম শ্রেণির সাহিত্যরচনা করা হয়ে থাকে এবং সেই সব সাহিত্য স্কুলের শ্রেণিকক্ষে পড়ানো হয়। আমাদের কিন্তু মেজাজের দিক থেকে ক্লাসিক বা ক্লাসিকাল কথাটা বুঝে নিতে হবে।

ক্লাসিক আদর্শ ঃ প্রাচীন এথেন্স - এর আনন্দনীয় স্থাপত্যকীর্তি 'পার্থেনন'। এই মন্দিরটি ছিল এথেন্স এর সমতল থেকে ২৬০ ফিট উঁচুতে তৈরি এক বিরাট পাথরের উপর স্থাপত্যকর্ম। এই মন্দিরের প্রতিটি অংশ

পরবর্তী অংশের সঙ্গে ছিল সুসমঞ্জস্য। প্রাচীন গ্রিকদের এই স্থাপত্যকর্মে এমন দুটি সত্য ধরা পড়ে যার নিরিখে শিল্প সাহিত্যকেও বিচার করা যেতে পারে, সত্য দুটি হল ঃ ১) একটি অখণ্ড সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ হবে সমগ্র অংশ। ২) অংশ ও সমগ্রের মধ্যে থাকবে যথার্থ অনুপাত। ক্লাসিক সৃষ্টির প্রতীক রূপে আমরা একটা Circle বা বৃত্তের কথা ভাবতে পারি। বৃত্তের কোনো অংশকেই ইচ্ছেমতো কমানো বা বাড়ানো যায় না তার পূর্বের সংগতি বজায় রেখে। গ্রিকদের শিল্পকর্মের এই যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল তা তাদের জীবনে সত্য ছিল না। বোধহয় জীবনে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উল্লাস ভোগ করে তারা বুঝেছিল এর নিরর্থকতা। তাই তাদের শিল্পকর্মে একটা সীমাশাসন থাকতই। পার্থেনন বা যে কোনো ক্লাসিকাল শিল্প আসলে এমন সৃষ্টিকর্ম যার মধ্যে আছে পরিমিতিবোধ, ঐক্য এবং সামগ্রিকতার মূর্ত প্রতীক। ঐহিকতা, মানবিকতা, বাহ্যরূপসৌন্দর্যে দৃষ্টির নিবদ্ধতা, প্রশান্তি ও ঐতিহ্যানুবর্তিতাই হচ্ছে ক্লাসিকাল শিল্পের লক্ষণ এবং ক্লাসিকাল বিচারপদ্ধতিও এসবের সঙ্গে যুক্ত। যার উজ্জ্বল নমুনা অ্যারিস্টটলের 'পোয়াটিকেস' এবং হোরেসের 'আর্স পোয়াতিকায়' (Ars Poetica)।

অ্যারিস্টটলে গুরু প্লেটো কাব্য-সাহিত্যের আনন্দদায়কতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে এক শ্রেণির কবি-সাহিত্যিককেই তাঁর আদর্শরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। প্লেটো মনে করতেন, মহৎ কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আসে আদর্শ লোক থেকে। এই আদর্শজগতের প্রতিবিম্বিন ঘটে বাস্তবে এবং বাস্তবের সত্যই প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যে। যেহেতু, সাহিত্যিক আদর্শজগতের পরবর্তী স্তরকে প্রতিবিম্বিত করেন। তাই সাহিত্যে প্রকৃত সত্য কখনও রূপ পায় না। প্লেটো তার এই ধারণা থেকেই কবিদের মিথ্যার সেবকরূপে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। একটি আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উপযোগী হয়ে উঠুক সাহিত্য-শিল্প-এই ছিল প্লেটোর কামনা। আদর্শায়ন ছিল প্লেটোর কাব্য সাহিত্য সম্পর্কিত ক্লাসিকাল, ধারণার বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, বা সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণাতেও প্লেটো আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশেষ অপেক্ষা নির্বিশেষের উপাসক। ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শও নির্বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি যে অ্যারিস্টটল গুরু প্লেটোর মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন এবং সাহিত্যকে আনন্দদায়ক বলে গ্রহণ করেছিলেন তিনিও ট্রাজেডি তথা সাহিত্যের উপাদান রূপে তাকেই স্বীকার করেছিলেন যার মধ্যে সম্ভাব্যের ইঙ্গিত আছে 'Not what has happened, but what may happen according to the law of probablity.' এই সম্ভাব্যতা হল কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে যা ঘটেছে তা সঙ্গে অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে তার একটি অনিবার্য সম্পর্ক থাকে। পোয়েটিকস-এ অ্যারিস্টটল এই সম্ভাব্যতার উপরে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই ইতিহাসের তুলনায় সাহিত্যকে 'more philosophical and higher than History' বলেছিলেন। সাহিত্য বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষে সার্বভৌমকে মিথ্যার কারবারি ভাবতেন, শিষ্য অ্যারিস্টটল সেখানে সাহিত্যিককে মনে করতেন সূক্ষ্মতর ও মহত্তর সত্যের রূপকার। সাহিত্যের নির্বিশেষ লক্ষ্য যেমন অ্যারিস্টটলের বিচার্য ছিল, তেমনি সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা-ট্রাজেডি ছিল তাঁর বিশেষ আলোচ্যবস্তু। ট্রাজেডিকে তিনি প্রথমে সম্পর্কিত করেন যাবতীয় শিল্পের সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে। তিনি যাবতীয় শিল্পে যে-নির্বিশেষ লক্ষণটি দেখেছিলেন তা হল 'মাইমেসিস' বা অনুকরণ। এই অনুকরণ শব্দটিকে কেন্দ্রে রেখেই তিনি ছিলেন ট্রাজেডির সংজ্ঞা। ট্রাজেডি নামক বিশেষ শিল্পধর্মকে বিভক্ত

করলেন ছ'টি উপাদানে। -কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র, মনন, ভাষা, সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা। এই ছ'টিই হল বহিরঙ্গ উপাদান। ক্লাসিকাল সাহিত্যসমালোচনার একটি মৌলিক লক্ষণ-ই হল বহিরঙ্গের রূপবিচার।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির কাহিনীবৃত্ত আলোচনায় জোর দিলেন Unity বা ঐক্যের উপর। পার্থেননের শিল্পকর্মের সঙ্গে অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্রাজেডির সংজ্ঞার মিল এখানে যে, উভয়ক্ষেত্রে অংশ এর সঙ্গে সমগ্রের একটি নিবিড় ঐক্যের সন্ধান মেলে। অংশ সমগ্রেরই অঙ্গীভূত, সুতরাং অবিচ্ছেদ্য। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ট্রাজেডির কাহিনীর শুরু - মধ্যভাগ সমাপ্তি কার্য-কারণের যোগসূত্র পরস্পরের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কে যুক্ত। অ্যারিস্টটল কার্য-কারণের ঐক্যের ব্যাপারটির উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশি। তা ছাড়া বলেছিলেন যে, কাহিনীর বিস্তার হবে সূর্যের একতার আবর্ত্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কোরাসের সর্বক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অভিনীত হতে হবে কাহিনীকে। একটি ক্লাসিকাল ভাস্কর্য বা স্থাপত্যে যেমন প্রতিটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়, ক্লাসিকাল সাহিত্যকর্মেরও তাই। সাহিত্যবিচারের সময় সমালোচককে দৃষ্টি রাখতে হয় এই সামগ্রিকতার দিকে। অ্যারিস্টটল যে প্লটকে ট্রাজেডির 'আত্মা' বলে অভিহিত করেছিলেন, তার অন্যতম কারণ। সম্ভবত কাহিনীর ভিতরকার totality বা Unity র বোধ। সার্থক প্লট থেকে ঘটনার কোনো অংশকে বর্ণনা করা যায় না অথবা প্লটের সঙ্গে যোগ করা যায় না নতুন কোনো ঘটনা।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডি তথা শিল্প-সাহিত্যের জগতে ইহজগতের আদর্শায়িত রূপায়ণ-লক্ষ করেছিলেন। শুধু প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে নয়, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রেও একই সূত্র তিনি কামনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ট্রাজেডির চরিত্রকে হতে হবে বাস্তবানুগ, যথাযথ, সদৃশ ও সুসংগত। ট্রাজেডির নায়কের পতনের কারণ তাঁর চরিত্রের কোনো প্রবণতার সীমাতিক্রমণ। নায়ক চরিত্র বাস্তবের রক্তমাংশের মানুষের মতোই হবে না। অতি ভালো, না অতি মন্দ। প্রাচীন গ্রিক নাটকের Dues ex machina অ্যারিস্টটল উপেক্ষা করেন নি, কারণ সেকালে জটিল পরিস্থিতি থেকে পরিণতিকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েই মঞ্চে আবির্ভূত হতেন অলৌকিক চরিত্র। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ট্রাজেডি হবে 'imitation of men in action' ট্রাজেডি মানুষের অনুকরণ—মানুষের কর্মের অনুকরণ। প্রাচীন গ্রিক ক্লাসিকাল সাহিত্য তাত্ত্বিক অ্যারিষ্টটল যেমন আদর্শায়িত জীবনের রূপায়ণের কথা বলেছিলেন, তেমনি বাস্তব সম্পর্কশূন্য নিছক কাল্পনিক জীবনসত্যের কথাও ভাবতে পারেন নি। চরিত্র এবং প্লট—ট্রাজেডির এই দুই মুখ্য উপাদানকেই অ্যারিস্টটল বেঁধেছিলেন পূর্বাপর সংগতির জোরে। ক্লাসিকাল সাহিত্য বিচার যে মূলত ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত—অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স এই ধারণাতেই পৌঁছে দেয়।

অ্যারিস্টটল সাহিত্যের ভাষার মধ্যে অলংকারের ব্যবহার পছন্দ করতেন। কিন্তু 'মেটাকোর' বা রূপক অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা কালে বলেছিলেন যে, অতিরিক্ত অলংকারের ব্যবহার বর্জনীয় কারণ তা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করতে পারে। ..... সাহিত্যের সমালোচনার সম্পর্কে আলোচনা কালে অ্যারিস্টটল বললেন যে, তাঁর পূর্বকাল পর্যন্ত সমালোচকেরা কোনো সাহিত্যকর্মের মধ্যে খুঁজে পেতেন বিশেষ কতকগুলি ত্রুটি, যেমন ঃ অস্বাভাবিকতা, নির্বুদ্ধিতা, অনৈতিকতা, ভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতা। তিনি শিল্পকে চেয়েছিলেন শিল্পরূপেই বিচার করতে। অ্যারিস্টটল নিঃসন্দেহে সমালোচনার জগতে ক্লাসিকাল পদ্ধতির প্রবর্তক যিনি অখণ্ড

সীমারেখার দ্বারা সমগ্রকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং অংশ ও সমগ্রের আনুপাতিক সম্পর্কে ছিলেন আস্থাশীল।

ইতালির হোরেস (খ্রিঃ পূর্ব ৬৫ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূর্ব ৮) ও ছিলেন সাহিত্যবিচারে ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তিনি অ্যারিস্টটলের পন্থায় 'মহিযেসিস' তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি ঠিকই, কিন্তু বলেছিলেন একজন অভিজ্ঞ কবির উচিত মানবজীবন ও মানবচরিত্রকে আদর্শরূপে দেখা এবং সেখান থেকে এমন ভাষার সন্ধান করা যাবে জীবনসত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু হোরেস কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দুটি পৃথক মতাদর্শকে একীভূত করে উত্তরকালে রেনেসাঁসের সাহিত্য সমালোচকদের আদর্শ রূপে গণ্য হোন। তিনি বলেন, 'কবি লক্ষ্য রাখেন উপকার বা আনন্দদানের দিকে অথবা আনন্দের মিশিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি পেয়েছেন সকলের সমর্থন, কারণ তিনি পাঠককে দিয়েছেন আনন্দ, যখন তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন'। হোরেসের মনের মধ্যে গ্রিক আদর্শ ছিল বদ্ধমূল, তাই তিনি বলেছিলেন, 'you must give your days and nights to the study of Greek models' এই গ্রিক মডেল নিজেও অনুসরণ করেছিলেন বলে হোরেস 'Organic Unity' র প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং উপযুক্ত ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনকে দিয়েছিলেন অগ্রাধিকার। অ্যারিস্টটল বহুক্ষেত্রে তুলনা করেছিলেন চিত্রের সঙ্গে। হোরেসও বলেছেন, 'A poem, is like a painting' । হোরেস কল্পনাশক্তির সামর্থের ওপর জোর দেন নি কিন্তু বিষয়নির্বাচন ছাড়াও জোর দিয়েছিলেন ভাবনার উপর এবং তিনি মনে করতেন যে মানুষ যথাযথ বিষয় নির্বাচন করতে পেরেছে তার কখনও ভাষা বা শব্দের অভাব হয় না। ভাষার সুনিপুণ বিন্যাসের জন্যই পুরোনো পরিচিত শব্দে লাগে নতুনত্বের ছোঁয়া। অ্যারিস্টটল পরিচিত ভাষার মধ্যে অপরিচয়ের ছোঁয়া আনার জন্যই 'মেটাফোর' ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কবি-সমালোচক হোরেস উপমার আশ্রয় নিয়ে বললেন। যেমন করে গাছ বৎসরান্তে পাতা ঝরিয়ে ফেলে, জন্ম দেয় নতুন পাতার, তেমনি কালে কালে পুরোনো শব্দ শেষ হয়ে যায় আসে নতুন শব্দ। একথাই যেন ভারতীয় আলংকারিকেরাও বলেছিলেন। আলংকারিক আনন্দবর্ধন বলেছিলেন, গাছের পুরোনো পাতা খসে নতুন পাতা একে যেমন গাছটাকেই নতুন বলে মনে হয়, তেমনি কাব্যের ক্ষেত্রেও পুরোনো শব্দ চলে গিয়ে নতুন শব্দ একে কাব্যকেও নতুন মনে হয়। সাহিত্যলোচনায় ভারতীয় আলংকারিকেরাও ছিলেন ক্লাসিকাল আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁরা শব্দ, অর্থ, অলংকার, রীতি প্রভৃতি বাহ্য উপাদানে যেমন মনোযোগী চিলেন, তেমনি ছিলেন শব্দ-নির্ভর ধ্বনি বা ব্যঞ্জনায় এবং বিভাবাদি উপাদান নির্ভর রসের উপর। খণ্ড থেকে অখণ্ডে, খণ্ডের বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যে ছিলেন বিশ্বাসী। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারে 'সামঞ্জস্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-প্রসঙ্গ। প্লেটো ইহজগতের প্রকৃত সুন্দরের সঙ্গে অলৌকিক আদর্শজগতের সামঞ্জস্য সন্ধান করেছিলেন। অ্যারিস্টটল সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় সন্ধান করেছিলেন order (শৃঙ্খলা), symmetry (সামঞ্জস্য), এবং Definiteness (স্পষ্টতা)। শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য-স্পষ্টতার সমন্বয়েই তো প্রাচীন পার্থেনন। প্রাচীন গ্রিকেরা খুঁজেছিলেন সীমার মধ্যে Perfection এবং তাঁদের কল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকত যুক্তির। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার এই কথাগুলিই মুখ্য।

১৮.৩ নব্য ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার

নব্য ক্লাসিক (Neo-classic)—ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারের মূলসূত্রগুলি উত্তরকালে ব্যবহৃত হয়ে গড়ে

তুলেছিল নব্য ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শ। ইংরেজি সাহিত্যে, বেন জনসন, ড্রাইডেন, পোপ, এডিসন, স্যামুয়েল জনসন প্রমুখ নিও-ক্লাসিক রূপে পরিচিত। এঁদের কিছু বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১. Traditionalism বা ঐতিহ্যবাদে বিশ্বাস, নতুন কিছু আবিষ্কার অনাস্থা এবং ক্লাসিকাল (বিশেষত রোমান) লেখকদের আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরা।

২. 'সাহিত্য' শিল্পকলার একটি অংশ। যদিও সৃষ্টির জন্য অন্তর্গত একান্ত প্রয়োজন। তথাপি দীর্ঘ পঠন-পাঠন ও অভ্যাসের উপর যেমন এর নির্ভরতা তেমনি পূর্ব দৃষ্ট সাফল্যের নিরিখেই সাহিত্যবিচার্য। কারিগরি দক্ষতা, শুদ্ধি, বিস্তরের দিকে মনোযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে নব্য-ক্লাসিকের আদর্শ ছিলেন হোরেস। তবে তাঁরা প্রতিভার স্বাভাবিক দান এবং শৈল্পিক সামর্থ্যক আবিষ্কার করেননি। নব্যক্লাসিকেরা মনে করতেন যে, মহাকালের বিচারে যে সব সাহিত্যস্রষ্টার রচনা স্বীকৃতি লাভ করেছে বা উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের রচনা রীতির নিয়মাবলি (যদি কিছু থাকে) তবে তা অনুকরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অ্যারিস্টটলের ট্রাজেডি তত্ত্বের যাঁরা ত্রয়ী-ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরাও এই নব্য ক্লাসিক মতাদর্শের প্রচারক।

৩. সামাজিক সংগঠনের মধ্যে একমাত্র মানুষই, নব্য-ক্লাসিকদের কাছে কাব্যিক বিষয়ের প্রাথমিক উপাদান। এঁদের মতে, সাহিত্যে অনুকরণের বিষয়বস্তু হল মানুষ। নিও-ক্লাসিক মানবিকতার আদর্শ অনুযায়ী, শিল্পের সার্থকতা শিল্পে নয়, মানুষে অনুসন্ধেয়।

৪. বিষয়বস্তুকে এবং শিল্পের আবেদন সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের সাধারণ-ধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'যথার্থ বুদ্ধি মানুষের চিন্তায় এসেছে, কখনও প্রকাশিত হয়নি' বলেছেন পোপ। কাব্য-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল, মানুষের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিকে নতুন এবং যথাযথ রূপে প্রকাশিত করা। মানুষের সাধারণ বোধ ও বুদ্ধিকে নতুন এবং নিখুঁতভবে প্রকাশ করার মধ্যেই তাদের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব প্রমাণ হবে। উদাহরণ স্বরূপ এঁরা বলেছেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে, অথচ শেক্সপীয়রের তাঁর নাটকে প্রাচীন বিষয়বস্তুকে এমন রূপ দান করেছেন যার ফলে তা কালোত্তীর্ণ মহিমা অর্জন করেছে।

৫. নিও-ক্লাসিক দর্শনে ও সাহিত্যে, মানুষের অহমিকা, নৈসর্গিক ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার বাসনা প্রভৃতির সমালোচনা করে মধ্যপন্থায় মানবিক ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দিকে আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের শিল্প-সাহিত্য কর্মকে একটি সীমার মধ্যে শাসন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। নিও-ক্লাসিক যুগের কবিরা মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির প্রশংসা করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরা নিজেরা লিখেছেন প্রবন্ধ, 'কমেডি অব ম্যানার্স এবং বিশেষত Satire বা শেষ। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা বিষয়, রূপ ও ভাষার কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।

নিসর্গ প্রকৃতি বা আদর্শকে অনুকরণ করাই নব/-ক্লাসিকদের মূল কথা। জনসন বলেছেন, কোনো সেরা কবির শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অনুকরণ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৌমাছি যেমন ভাবে মধুসংগ্রহ করে মৌচাক গঠন করে, পূর্বাদশ থেকে সাহিত্যের উপাদান সেইভাবেই সংগ্রহ করবেন উত্তরকালের লেখকরা। নিও-ক্লাসিক

সেইজন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'মেমারি' বা স্মৃতিশক্তির উপর। অনুকরণ, অভ্যাস, পাঠ এবং অতঃপর শিল্প সৃষ্টি এই ছিল এঁদের মতে মূল কর্ম। জনসনই ইংরেজ সাহিত্যে প্রথম নব্য-ক্লাসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন, পরে এসেছিলেন ড্রাইডেন। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে কর্ণেই ছিলেন নব্য-ক্লাসিক ; যিনি অ্যারিস্টটল কথিত সম্ভাব্যতা বা probablity কে ব্যাখ্যা করেছিলেন সাদৃশ্যের সম্ভাব্যতা বলে এবং necessity-কে নাটকীয় প্রয়োজনীয়তার আবশ্যিকতা বলে। সপ্তদশ শতকে ড্রাইডেন বলেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো নাটক, আসলে নিসর্গকে আদর্শায়িত করে অতঃপর তার রূপায়ণ। নাটক কতকগুলি মানুষের বিচ্ছিন্ন সংলাপ নয়—একটি সম্পূর্ণাবয়ব শিল্পকর্ম। অ্যারিস্টটলের 'প্লট' - আলোচনায় যে-ঐক্যের কথা আছে ড্রাইডেন, কর্ণেই এবং একইসময় রাসিন তা উত্থাপন করেন। হোরেসের 'আর্তসপোয়োতিকার' ঢঙে আলেকজাণ্ডার পোপ লেখেন 'Essay on criticism' কবিতার ছন্দে পোপ কাব্য-সাহিত্যে নিসর্গের ভূমিকা ব্যাখ্যা করলেন। অষ্টাদশ শতকে যোসেফ এডিসন দার্শনিক লকের পন্থায় অগ্রসর হয়ে Imagination শব্দটির ব্যাখ্যা করেন। এডিসন প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে অ্যারিষ্টটলীয় তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন আনন্দদায়ক বস্তুর অনুকরণ অতৃপ্তির বস্তুর অনুকরণের থেকে অধিকতর আনন্দদায়ক। এডিসন, সাহিত্যের আনন্দের কারণ হিসেবে বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা-নির্ভর বস্তুর নতুন রূপ দর্শন এবং তাকে সুন্দর মূর্তিতে দর্শন এই দুটির কারণে সাহিত্য হয়ে ওঠে আনন্দময়। অ্যারিষ্টটল যেমন সাহিত্যকে তুলনা করেছিলেন ছবির সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিও-ক্লাসিক হোরেস এবং সপ্তদশ শতকের ড্রাইডেন ও ফ্রেসিংও তাই করেছিলেন। ড্রাইডেন লিখেছিলেন—এমন প্রবন্ধ যার শিরোনাম ছিল 'Parallel Between Poetry and Painting' ছবি ও কবিতা উভয়েরই অনুকরণের বিষয়বস্তু 'মানুষ'। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি কবিতার উপর অনেকে লক্ষ্য করেছেন চিত্রের প্রভাব। অষ্টাদশ শতকের লেসিং এর অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য ও চিত্রের সম্পর্ক। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক আলোচনা শুরু হল। এই সময় কাব্য ও সংগীতের সম্পর্ক তিনদিক থেকে নির্ণীত হয়ে থাকে—১) টেকনিক্যাল এবং ফর্মল (কাব্যে প্রধান হল ভাষা এবং সংগীতের সুর)। ২) অনুকরণ, ৩) প্রকাশ ..... বস্তুত সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক, সাহিত্যের সঙ্গে নিসর্গের সম্পর্ক, সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন ক্লাসিকাল আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন নব্য-ক্লাসিকোর। নব্য-ক্লাসিকেরা উইট (বুদ্ধি), যাজমেন্ট (বিচার) ও রিজন (যুক্তি) এই তিনকে সর্বদাই শিল্প সাহিত্যে সৃষ্টি ও বিচারের নিরিখ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

১৮.৪ রোমান্টিক সমালোচনা

রোমান্টিক কাব্য-কবিতা রোমান্টিক সাহিত্য তত্ত্বভাবনা তথা নান্দনিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকরূপে যাঁকে চিহ্নিত করা হয় তিনি প্রথম খ্রিষ্টাব্দের গ্রিক দার্শনিক লঞ্জাইনাস বা লঙ্গিনুস (Longinus) । তিনি লিখেছিলেন 'On The Sublime' নামে বই। প্রকৃত Sublime কী তার উত্তরে লঞ্জাইনাস বলেছিলেন, অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা প্রকৃত Sublime আমাদের অন্তরকে তুলে ধরে। প্রকৃত

Sublime মানুষকে সীমার শাসন থেকে মুক্তি দিয়ে চিরন্তন আনন্দ দিয়ে থাকে। লঞ্জাইনাস বলেছেন, 'ইমেজ' হল একটি মানসিক বোধ, এই বোধ থেকে জন্ম নেয় ভাষা এবং সেই ভাষা পাঠকের ভাবজগতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করে যাতে মনে হয় শ্রোতা বা পাঠক বর্ণিত বিষয়বস্তুকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে 'The True Sublime' সম্পর্কে আলোচনার সময় লঞ্জাইনাস বললেন, যথার্থ 'সাবলাইমে'র অনুভূতি পাঠককে নিয়ে যায় লেখকের স্তরে। তাঁর বিভব সৃষ্টি হয় স্রষ্ট-শোভন অহংবোধ। লেখকের সৃষ্টিকালীন ভাবাবেগের স্বরূপ লেখকই ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তা পাঠক অনুমান করতে পারলেও কিছুতেই অনুভব করতে পারেন না। লঞ্জাইনাস বলেছেন, যে-লেখা পাঠককে যেভাবে স্পর্শ করে না এবং পাঠকের অন্তরেও প্রতিক্রিয়া জায়গায় না তা কোনভাবেই 'Sublime' নয়। অর্থাৎ যাকে আমরা চিরায়ত রচনা বলে থাকি তাকেই লঞ্জিনুস বলতে চেয়েছেন 'Sublime'। ত্রিশসংখ্যক পরিচ্ছেদে তিনি আরও বললেন, চিন্তা এবং ভাষা পরস্পর সাপেক্ষ। লঞ্জাইনেসের ভাষায় 'words finely used are in truth the very light of thought' অর্থাৎ সুন্দর করে ব্যবহার করা ভাষায় চিন্তার আলো ঠিকরে পড়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভাষার কাজই হল পাঠককে ভাষাতীত লোকে পৌঁছে দেওয়া। লঞ্জাইনাস মানতেন যে, কবিতার প্রতিক্রিয়া যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্ত লোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি মনে করতেন যে, কাব্য কবিতার কাজ পাঠকের মনকে উদ্দীপিত বা আলোকিত করা এবং তা বিচারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। লঞ্জাইনাস বললেন, 'In general we may consider the passages which always please, and please all readers, Contain the beauty and truth of the sublime' অর্থাৎ যে সমস্ত রচনাংশ আমাদের সমস্ত পাঠকদের তৃপ্ত করে তার মধ্যেই এর সত্য ও সৌন্দর্য।

দীর্ঘকাল পরে রোমান্টিক সাহিত্যদর্শনের ধারা নতুন করে প্রবাহিত হতে শুরু করে ইমানুয়েল কান্ট-এর সময় থেকে। কান্ট মনে করতেন, সৌন্দর্যের বিচার বিশ্বজনীন এবং সব মানুষের ক্ষেত্রেই এক। তিনি বললেন, একমাত্র জ্ঞানই অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। সেই কারণে সাহিত্যকে এমন ভাবে রূপ দিতে হয়, যাতে তা অপরের কাছে জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। কান্টের সেই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিল আধুনিক রূপবাদ। কান্টের দর্শন থেকে জন্ম হয় আর্টবাদেরও। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করে নিলে প্রতিভা নামক অন্তর্গত শক্তিকে। কান্ট বললেন, মানুষকে যা তৃপ্ত করে তা আনন্দদায়ক, যা আনন্দেয় তাই সুন্দর যা তার স্বীকৃত হয় তাই মঙ্গল। মনুষ্যতর প্রাণীরও তৃপ্তির বোধ আছে, কিন্তু মানুষের কাছে সৌন্দর্যের বোধ। কান্ট বললেন, যে তৃপ্তির মধ্যে আমাদের কামনা জড়িয়ে থাকে না তাকে এককথায় বলা যায় 'subjective university' বা চিন্ময় বিশ্বজনীনতা। যেহেতু সৌন্দর্যের বিচার করে 'মন' ; সুতরাং এমন কোনো নিয়মকানুন নেই যার দ্বারা সৌন্দর্যের বিচার সম্ভব। কান্ট আনন্দ ও কল্যাণের সঙ্গে সৌন্দর্যকে মিশিয়েছিলেন। তদুপরি সৌন্দর্য ছিল তাঁর কাছে উদ্দেশ্যহীন। সুন্দর সৃষ্টি করে 'প্রতিভা'।

একদা প্লেটো, শিল্প সাহিত্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা অলৌকিক শক্তির প্রভাবের কথা ভেবেছিলেন। প্লেটো বিশ্বাস করতেন, যাবতীয় সৃষ্টির প্রেরণা নেমে আসে ঊর্ধ্বতম পরম সত্যের কাছ থেকে। সেই সত্য প্রতিবিম্বিত হয় বস্তুজগতে এবং অতঃপর বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে সাহিত্যে। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল সাহিত্য

সৃষ্টির প্রেরণা সন্ধান করেছিলেন অনুচিকীর্ষার মধ্যে। মানুষের অন্যতম প্রবণতা হল অনুকরণ করা। অনুকৃত বস্তুররূপদর্শনে আনন্দ পায় সে। কান্ট, মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে দেখলেন 'প্রতিভা' নামক এক অন্তর্নিহিত শক্তির প্রাধান্য। তাঁর মতে, 'প্রতিভা' যেমন অন্তর্নিহিত শক্তি তেমনি তা মৌলিক ব্যাপারও। মৌলিকতাই তার প্রথম উপাদান। এই মৌলিকতার জন্যই বর্হিজগতে যে বস্তু অসুন্দর শিল্প সাহিত্যে তাই হয়ে ওঠে সুন্দর। এই মৌলিকতার সঙ্গে যুক্তি হয়ে আছে শিল্পী বা প্রাতিভজ্ঞান। কান্ট রোমান্টিক সাহিত্য দর্শনকে দিয়েছিলেন, কল্পনাতত্ত্ব, রূপকৈবল্যতত্ত্ব, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্ব, মৌলিকতা, প্রাতিভজ্ঞান এবং বিশ্বজনীনতার বোধ। জার্মান দার্শনিক শিলিং, শিলার এবং ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার কান্টীয় নন্দনতত্ত্বকে বিস্তার দান করেছিলেন। শিলিং, দর্শন ও শিল্পের সম্পর্ক আলোচনা করে বললেন, দর্শন যখন বস্তুর স্পর্শ পায় তখন হয় সাহিত্য, আর সাহিত্য যখন বস্তুর সম্পর্ক বিরহিত হয় তখন হয়ে পড়ে দর্শন।

আর্টকে তিনভাগে ভাগ করলেন হেগেল-ক্লাসিকাল, রোমান্টিক ও সিম্বলিক। হেগেলের মতে, ক্লাসিকাল আর্টের দৃষ্টান্ত হল ভাস্কর্য। তিনি মনুষ্যরূপকেই ক্লাসিকাল বলে গণ্য করেন। স্থাপত্য হল সিম্বলিক আর্টের নিদর্শন। আর রোমান্টিক আর্টে 'ফর্ম' ও 'আইডিয়া' শিল্পকর্মে 'কর্ম' টাই চূড়ান্ত নয়। শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অন্তর। সিম্বলিক আর্টে প্রাধান্য পায় 'আইডিয়া' বা কন্টেন্ট - এর অসাধারণ মিলন ঘটে। 'গান' এবং কবিতা হল এই গোত্রের শিল্প। কান্ট যেমন কবিতাকে সর্বোত্তম শিল্পকর্ম বলেছিলেন, হেগেলও তাই বললেন। হেগেল বললেন, কবিতা হল মনের এক বিশ্বজনীন শিল্পকর্ম। কবিতা মুক্ত। কবিতা স্থান-কালতীত ভাবাবেগকে ইহগ্রাহ্য রূপ দান করে থাকে। কবিতা হল যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে উত্তম। যাবতীয় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় যে কল্পনার, কবিতা সেই কল্পনাকে সার্থক ইহগ্রাহ্য রূপ দিয়ে থাকে। কাব্য-কবিতা, হেগেলের মতে, অসীমকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে। ১৭৯৮-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ একসঙ্গে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশ করলেও দু'জনের পথ যেন দুটি পৃথক দিকে নির্দিষ্ট হল। ওয়ার্ডওয়ার্থের কাছে নিসর্গ প্রকৃতি তথা অতিপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের ভাবব্যঞ্জনা ছিল প্রধান আর কোলরিজ অতিপরিচিতের মধ্যে টেনে আনতে পারতেন অলৌকিকতার রোমাঞ্চ। ওয়ার্ডওয়ার্থ মুখের ভাষাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন চিরকালের কাব্যভাষা। অপরপক্ষে কোলারিজ মধ্যযুগীয় বাতাবরণে রচনা করলেন 'ক্রিসটারেল', রহিম অব দি অ্যানুসিয়েন্ট মেরিনারে'র মতো কবিতা। কাব্যের ভাষা, কাব্যের কল্পনা, সম্পর্কে এই রোমান্টিকদের স্বীকৃতি পাওয়া গেল শেলীর 'A defence of peotry' তে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Lyrical Ballads' এর মুখবন্ধে এবং কোলরিজের 'Biographia Liferaria'-তে।

অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিকাল কবিদের পন্থা বর্জন করে শেক্সপীয়র অনুরাগী জীউস বললেন যে কবিতা রচনার প্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে 'কল্পনা'। কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে এই কল্পনার দ্বারাই এক একটি কবিতার মূর্তিতে তুলে ধরেন। কীটস-এর মতে, কল্পনা যাকে সুন্দর বলে স্বীকার করে নিয়েছে তা-ই সত্য ; বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না থাক। এই 'কল্পনা' এমন একটি শক্তি যার সাহায্যে সৃষ্ট কবিতাকে মনে হয় বৃক্ষে নবপত্রাদ্গমের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। কাব্য সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তবে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন অনুভূতির মৌহতিক অসংযত প্রকাশই কবিতা নয়। কাব্যের জন্ম

'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন' থেকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন'-এর মধ্যে পার্থক্যের ওপরেও আলোকপাত করেছে। তবে 'কল্পনা' ও 'ফ্যান্সির' মধ্যে পার্থক্যরেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেভাবে টেনেছেন কোলারিজ সেভাবে টানেন নি। কোলারিজ খানিকটা কান্টের পথ অনুসরণ করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন, 'ফ্যান্সি' ও 'ইমাজিনেশন' হল একই কল্পনাশক্তির দুটি স্তর মাত্র। অপরপক্ষে কোলারিজ কল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করলেন কান্টের মতোই। কান্ট বলেছিলেন, কল্পনা হল ঃ 'Productive, Re-Productive' এবং Aesthetic আর কোলারিজ বললেন কল্পনা হল ঃ Fancy, Primary imagination এবং Secondary imagination। দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্য পদবিতে উন্নীত করতে চেয়ে বলেছিলেন যে, কবিতার ভাষা হল 'a selection of the real language of man or the very language of man and that there was no essential difference between the language of prose and that of poetry'। কোলারিজ বললেন, মানুষের জ্ঞান, ক্ষমতা ও অনুভূতির গভীরতা অনুযায়ী ভাষা পৃথক হয়। একই শ্রেণি বা ভিন্ন শ্রেণির দুটি মানুষ কখনও এক ভাষা ব্যবহার করে না, যদিও শব্দ, শব্দবঙ্গ সবই এক। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গদ্য ও কবিতার মধ্যে ভেদরেখা মুছে দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু গদ্য ও কবিতার ভাষাগত বিভিন্নতা কোলারিজ স্পষ্টতই স্বীকার করলেন। কবি ব্যবহার করেন ছন্দ, ছন্দ গড়ে ওঠে শব্দ ব্যবহারের কৌশলের দ্বারা। সমালোচক হিসেবে কোলারিজকে বলা হয় Impressionist Romantic।

এইভাবে লঞ্জাইনাস থেকে শুরু করে কোলারিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্যন্ত বিভিন্ন সমালোচকদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল রোমান্টিক সাহিত্যরীতি। ক্লাসিকাল মতবাদীদের সঙ্গে রোমান্টিকদের পার্থক্য এইখানে যে, ক্লাসিক ও নব্য-ক্লাসিকদের কাছে 'রূপ'-'বাহ্যরূপ' প্রধান এবং তাঁরা সন্ধান করেন সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা, পরিমিতি। রোমান্টিকেরাও 'কর্ম'-এর উপর গুরুত্ব না দেন তা নয়, তবে তাঁরা রূপের অন্তরস্থ 'আত্মা'-কে খুঁজে করেন। ক্লাসিকাল মতবাদীদের কাছে মানুষের মূল্য মানুষ হিসেবে আর রোমান্টিকেরা সন্ধান করেন আত্মাকে। ক্লাসিকেরা চান শান্তি, রোমান্টিকেরা চান নিত্য নতুন রহস্যের আবিষ্কার। ক্লাসিকেরা পছন্দ করেন ঐতিহ্য, রোমান্টিকেরা পছন্দ করেন নবীনত্ব। রোমান্টিক আর্ট হল বিস্ময়ের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিশ্রণ, জিজ্ঞাসার সঙ্গে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার সংযোগ। এইখানে ক্লাসিকাল রচনা থেকে রোমান্টিক রচনা পৃথক হয়ে পড়ে।

১৮.৫ বস্তুবাদী সমালোচনা

শিল্প-সাহিত্যে 'বাস্তব' শব্দটি এসেছে দর্শন থেকে। দর্শনে এর ব্যবহারে কখনো 'শেমিনালিজম্' বা কখনো আইডিয়া লিজমের বিপরীতার্থে। শিলার এবং শ্লেগেল, এই দুই দার্শনিক অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প সাহিত্যে 'external reality' অর্থে 'realism' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যে শব্দটিকে তেমনভাবে কাম্য মনে করেননি। নতুবা ১৭৯৮-এর একটি চিঠিতে শিলার গ্যেটেকে লিখতেন না যে - রিয়ালিজম্ - এর প্রতি আসক্তি থেকে কেউ কবি হন না। আসলে যেহেতু realism বলতে তখন external reality-র হুবহু অনুকরণ বোঝান হত তাই সাহিত্যে এই শব্দের অনুপ্রবেশের তাৎপর্য শিলার-এর কাছে খুব সুখদায়ক মনে হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে ভাববাদী রোমান্টিকদের কাছে 'realism' শব্দটি বাহ্যবস্তুর অনুকরণ ছাড়া কিছু ছিল না। এই অর্থেই 'বাস্তব' শব্দটিকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো

আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে'। কিন্তু সত্যিই কি আর্টের মধ্যে বাস্তবতা প্রবেশ করলে তার অন্তরের রস নিঃশেষ করে ফেলে ? এই উত্তরে বলা যায় যে, বাস্তবতা আর্টের অন্তরের রস নিঃশেষ করে না ফেলে আর্টকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং তার প্রমাণ বিগত এক শতকের বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

'External reality'- ই যদি সাহিত্যের 'বাস্তব' হয় তাহলে বিষয়টাই হয় বাস্তববাদী সাহিত্যের আধার, বিষয়ীর কোনো মর্যাদা থাকে না সেখানে। কিন্তু এমন সাহিত্য বা শিল্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব যেখানে বিষয়ীর কোনো ভূমিকা থাকে না ? হয়তো রোমান্টিক কাব্য 'বিজয়ী' প্রধান 'বিষয়' গৌণ। কিন্তু এর অর্থ এই হয় যে, রোমান্টিক কাব্যে বিষয়ের এবং বাস্তববাদী সাহিত্যে বিষয়ীর কোনো মূল্য নেই। তাই যদি হয় তাহলে রোমান্টিক কাব্যে শুধু কবির অলীক কল্পনা, এবং বাস্তববাদী সাহিত্য হল কতকগুলি বাস্তব ঘটনার সমাহারমাত্র। কিন্তু সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, একথা সত্য নয়। কি রোমান্টিক, আর কি বাস্তববাদী কোনো সাহিত্যই 'মনের পরশ' ছাড়া রচিত হয় না। এইখানেই ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে চিত্রকরের মৌলিক পার্থক্য। শিল্পী, তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, বস্তুজগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করেন মনের নির্বাচন দক্ষতা দিয়ে এবং তাকে যখন শিল্পমূর্তিতে স্পষ্ট করে তোলেন তখন 'মন'-ই তাঁর প্রধান সহায়। সুতরাং জগতের উপর মনের কারখানা, মনের উপর বিশ্বমানের কারখানা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি সেই উপরতলা থেকে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। বাস্তববাদী রুশ-দার্শনিক রেলিনস্কির মুখে গত শতকের প্রথমার্ধে শোনা গিয়েছিল ঃ 'Fidelity to nature is not the be all and end all of art' ... ... 'The truth is that imagination in art plays the most active, the leading role.'। লেখকের কল্পনা, মর্জি, যুক্তিবুদ্ধির খুবই মূল্য স্বীকার করতেন তিনি, যেহেতু শিল্পের জগৎ ছিল তাঁর কাছে নতুন সৃষ্ট এক জগৎ—'Art is the representation of reality, the republicated, or, as, it were, newly Created world.'। এই নতুন জগতে, তাঁর মতে, সত্যের সঙ্গে কল্পনার, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের কোনো দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং তারা পরস্পরের সহযোগী। শিল্প সাহিত্যের জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতের পারস্পরিক বৈপরীত্যকে একটি স্বীকৃত সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন ভাববাদীরা। বিজ্ঞানের জগৎ তাঁদের কাছে ভাবনা ও চিন্তার জগৎ, বস্তুর জগৎ, অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের জগৎ ভাব ও আবেগের জগৎ তথা কল্পনার জগৎ। কিন্তু বেলিনস্কির মতে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য ভাব ও ভাবনায় পার্থক্য নয়, এই পার্থক্য রূপায়ণপদ্ধতিগত। সাহিত্যের কাজ প্রদর্শন, বিজ্ঞানের কাজ প্রমাণ। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল '... ... art and science are equally indispensible, and neither Science can replace art nor art replace Science,' (Ibid, P-432)। এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞানের এই ক্রমোন্নতির দিনে মানুষ যখন চিরকালীন বিশ্বাস ও ভরসার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে বস্তুজগৎকে অবলম্বন করতে শুরু করেছে তখন একজন শিল্পীর ভূমিকা কী হবে ? তিনি কি কল্পলোকে বিশ্রাম করবেন, না কি সুখ-দুঃখ ভরা যে বাস্তবজীবন তাকে গ্রহণ করবেন ? আসলে মনে রাখতে হবে যে, একজন শিল্প তাঁর দেশ-কালের সন্তান। ফলে শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্যের জোরে তিনি তাঁর সমকালকে অস্বীকার করতে পারেন না। পারেন না যুগের চাহিদাকে বিসর্জন দিতে। যেহেতু তাঁর কাল ও পরিবেশ থেকে শিল্পী তার প্রাণের রস সঞ্চয় করে থাকেন, সুতরাং সেই কাল ও পরিবেশকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

যাঁরা চিরন্তন-সাহিত্যের কথা বলেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হল—স্থান বা যুগের পরিবর্তন হলেও মানবপ্রবৃত্তি যেহেতু অপরিবর্তনশীল এবং মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রই সাহিত্যের উপজীব্য অতএব ক্ষণ-চঞ্চল সমস্যাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করলে সে সাহিত্য চিরজীবী হতে পারে না। শেক্সপীয়ার বা কালিদাস চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টা, যেহেতু কোনো বিশেষ দেশকালের স্পর্শ লাগেনি তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুক্তি খুব কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। স্রষ্টা হিসেবে কালিদাস বা শেক্সপীয়ার বা কালিদাস চিরন্তন সাহিত্যের স্রষ্টা, যেহেতু কোনো বিশেষ দেশকালের স্পর্শ লাগেনি তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু এ যুক্তি খুব কঠোর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। স্রষ্টা হিসেবে কালিদাস বা শেক্সপীয়ার তাঁদের যুগের সন্তান, এই হচ্ছে সত্য। বিক্রমাদিত্যের কাল বা এলিজাবেথীয় যুগ দ্বিতীয় একজন কালিদাস বা দ্বিতীয় একজন শেক্সপীয়ার দেয়নি বলেই যে এঁরা দেশ-কালের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত তা অবশ্যই নয়। দ্বিতীয়তঃ মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি শাশ্বত হলেও তাদের প্রকাশ চিরকাল এক নয়। সমাজের সঙ্গে ব্যাষ্টির সম্পর্ক নিত্য পরিবর্তনশীল। সমাজের সমস্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যে-অবস্থায় মূলবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, বঞ্চনা ও শোষণের স্বরূপ বদল হয়েছে সেই অবস্থান সাহিত্যের বিষয়বস্তু, জীবন সম্পর্কে সাহিত্যিকদের বোধ নিশ্চয়ই প্রাচীন কোনো আদর্শে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। রুশযুগ ও পরিবেশের সন্তান হিসেবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিত্য নতুন সমস্যা সাহিত্যিক অঙ্গীকার করতে বাধ্য। বস্তুবাদী দার্শনিক চেরনিশেভস্কি ও ডোব্রোলিউবফ বলেছিলেন, বাস্তবজীবনে যার অস্তিত্ব নেই, সাহিত্যে তা কদাপি রূপায়িত হবে না। সাহিত্য হবে প্রচারের মাধ্যম এবং কেমনভাবে এই প্রচারকার্য সম্পন্ন হয় তার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের মর্যাদা। এখন প্রশ্ন হল, বাস্তবের কোন্‌টি শিল্পী গ্রহণ করবেন এবং কোন্‌টি বর্জন করবেন ? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষের জীবনের মূল-সমস্যা কেন্দ্রীভূত যেখানে, শিল্পীর সৃষ্টির উপাদানও সেখানেই মিলবে। মানুষের প্রবৃত্তিগুলি স্থান কালোত্তীর্ণ। সুতরাং মানব-সম্পর্কের বিকাশ বিষয়ে সচেতন শিল্পীরা চিরকালই দেশকালোত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। কিন্তু সংশয়বাদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন যে, দেশের গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে কালের গণ্ডি অতিক্রম করতে তাঁরা পারবেন নি ? এর উত্তরে বলা যায় যে, শতাব্দীর বাধা ভেঙেছেন এঁরা, একালের পাঠকেরাই তার প্রমাণ। তবে যেহেতু ভবিষ্যতের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় তখন সংশয় করাটাও নিরর্থক। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচনা করে বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, বঞ্চিতের সংগ্রামী ছবি এঁকেছেন। তার জন্যই আগামীকাল স্মরণ করবে তাঁদের।

শুধু বিষয়ের গুণে কেউ শিল্পী নন, 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি'—এই দুই-এ মিলে তবে একজন শিল্পী হন। ১৮৩১-এ ফরাসি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক বালজাক বলেছিলেন,—বই লেখার আগে লেখককে হতে হবে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ ও রূপায়ণে দক্ষ, মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও অনুভূতির সঙ্গে সুপরিচিত এবং গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও রূপায়ণ দক্ষতা এই তিনটি উপাদানের উপরই লেখকের সাফল্য নির্ভর করে বলে মনে করতেন বালজাক। স্তাদাঁলও উপন্যাসকে শুধু বাস্তব ঘটনার সমাহার রূপে দেখেন নি। তাঁর মতে, উপন্যাস হচ্ছে এমন একখানি 'আরশি' যেখানে নীল আকাশ ও 'কর্দমাক্ত পথ' দুই-ই স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় পুশকিন, স্তাদাঁল, বালজাক ও ফ্লোব্যার থেকে আরম্ভ করে হেনরি জেমস্ পর্যন্ত বা তার কোনো বাস্তববাদীই শুধু 'কর্দমাক্ত পথ-এর

রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি তাঁদের সাহিত্যে। অথচ ভাববাদীরা বাস্তববাদীদের সম্পর্কে একথাই বলেন যে, এঁদের কাছে ফুল অপেক্ষা কদম বাস্তব, যা নীচে থাকে তা তত বাস্তব। আসলে বাস্তবাদীরাই প্রথম নীচুতলার মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সক্ষম হয়েছিলেন সামাজিক উৎপীড়ন ও শোষণের ক্লেদাক্ত ছবি তুলে ধরতে, তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের এই অভিযোগ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, ফ্রান্সে যখন স্তাদাঁল বালজাকের যুগ তখন ফ্রান্সে গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে, শুরু হয়েছে অবক্ষয়ের পালা। এই পরিস্থিতিতে লেখকেরা বিরক্তিসহ সমকালের দিকে তাকালেন, নিজেদের লেখনীকে ব্যবহার করলেন সামাজিক অধঃপতনের অস্ত্ররূপে। পূর্বসূরীদের মতো আত্মজৈবনিক রচনা না লিখে ফুটিয়ে তুললেন পুঁজিপতিদের সুতীব্র অর্থলালসা, চারিত্রিক অবিশুদ্ধতা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও গোপন ব্যভিচারের ছবি। বালজাক তাঁর বিখ্যাত 'ড্রোল স্টোরিজ'-এ বিত্তবান পরিবারের মানুষগুলো চরিত্রের বিভিন্ন দিকের দৈন্যকে ফুটিয়ে তুললেন নিপুণ সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে। ডাস্টয়েভস্কির 'Crime and Punishment' ফ্লোব্যার এর 'বাদাম বোভারি' প্রভৃতি রচনায় ধনতন্ত্রের কুফলের ছবি আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কথিত 'মানবচরিত্রের দীনতা' হার্বার্টরীড কথিত 'aspect of life ... ... least flattering to human dignity' বালজাক প্রমুখের উপন্যাসে আপাতভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্তাদাঁলেরে জুলিয়েঁ শেরেল, বালজাকের Raphael প্রমুখ তাঁদের মুক্ত হৃদয় ও আদর্শবোধ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে ধনতন্ত্রের অনিবার্য কুফলের বিরুদ্ধে। বালজাক জানতেন অভিজাতদের কথা, নয়া বিত্তবান শ্রেণির কথা। তাই ধনতন্ত্রের ধ্বংসকে অনিবার্য জেনেছিলেন, সহানুভূতি প্রকাশ করেছিএলন শ্রমজীবীর প্রতি।

যে পদ্ধতিতে ফ্রান্সে বাস্তবজীবন-সমস্যাকে রূপায়িত করেছিলেন বালজাক প্রমুখ শিল্পীরা, সেই একই পদ্ধতি রুশ-সাহিত্যে ব্যবহার করলেন পুশকিন-গোগোল-আলেকজান্দার এবং কিছুটা অন্যরকম বললেও লিও-তলস্তয়, আর ইংরেজি-সাহিত্যে ডিফেন্স ও হেনরি জেমস্ প্রমুখ। পুশকিন বিশ্বাস করতেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই মানবচরিত্র গড়ে ওঠে ; আর তাই তিনি তাঁর নায়কের কারণ সন্ধান করেছিলেন সামাজিক ঘটনার মধ্যে। পুশকিন কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে লিখলেন The Cap। এই উপন্যাস লেখার সময় তিনি যথার্থ বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে কাজান, ওরেনবার্গ, আরও বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অর্থাৎ জীবনকে বাস্তবতার পটে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। গোগোলের রচনার যথাযথতা, অস্টোভস্কির দাসত্ব বিরোধী-জীবন-মুক্তি-কামনা, এঁদের সমাজ জীবনের সঠিক বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সাহিত্যের বর্ণনায় বাস্তবানুগত্য প্রমান করে। টলস্টয় এঁদেরই মতো ধনতন্ত্রের সমালোচক। ফরাসি ও রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদীরা যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা তুলে ধরেছেন 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'বিল্ক হাউস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা চার্লস ডিফেন্স।

এখন উনবিংশ শতকের ফরাসি, রাশিয়া ও ইংরেজি সাহিত্যের বাস্তববাদীদের যে স্বভাবধর্ম তাঁদের সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল ঃ

ক) বিশ্লেষণ-প্রবণতাই এঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

খ) ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের দ্বন্দ্ব এঁদের সকলের রচনারই উপজীব্য বিষয়।

গ) শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন এরা।

ঘ) ধনতন্ত্রের চাপে ব্যক্তিহৃদয়ের যন্ত্রণার ভাষ্যকার এই বাস্তববাদীরা।

ঙ) বর্ণনায় যথাযথতা বজায় রাখতে চেয়েছেন সকলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি তত্ত্বগতভাবে বাস্তববাদীরা এই সত্য মানতেন যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক, সমস্যা হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত, চরিত্র হবে সজীব প্রাণবান। লেখক হবেন জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তাঁর বর্ণনা হবে যথাযথ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই বাস্তববাদীরা জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকটের ছবি তুলে ধরলেও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। বালজাক স্পষ্টই মনে করতেন এই পরিবর্তন উপরের কোন শক্তি দ্বারা সাধিত হবে। ব্রান্ট এবং ডিফেন্সও পরিবর্তন চেয়েছেন, কিন্তু এঁরা কেউই সমাজের স্থিতাবস্থার পরিবর্তন কামনা করেন নি। এই জাতীয় বাস্তববাদীদের গোর্কি 'Critical realists' নামে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই বাস্তবতার চিত্র ফুটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মতো মহান শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক, তাই জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যে কোনো রকম বাস্তবতার অনুপ্রবেশককে সহ্য করেন নি। অবশ্য পরবর্তীকালে শুধু আপত্তি তুলেছিলেন বাস্তবের নামে জঘন্যতার আমদানির বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশিতে' বাস্তবজীবন-সমস্যার রূপ দিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের মতো এবং 'যোগাযোগ' মধুসূদনের মতো বাস্তব চরিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন তাই রক্তকরবীতে যক্ষপুরীর বঞ্চিত মানুষগুলিকে একটি বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে না দেখিয়ে রাজারই ভিতর থেকে জাত ভূমিকম্পে তার আত্মার জাগরণ দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও আছে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘকালীন অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং বঞ্চনা ও শোষণের বেদনাদায়ক আলেখ্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রও সত্যের প্রতিলিপিকর মাত্র, সমাজ-মুক্তির পথ প্রদর্শক নন। আর তারাশঙ্কর দেখেছেন প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের তিরোধান, কলকারখানাভিত্তিক ধনতন্ত্রে প্রসার। তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচক ; কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন অতীতে সামন্ততন্ত্রের জন্য। 'Critical realists' রা অনেকেই এই পশ্চাদমুখীনতার ত্রুটিতে ভুগেছেন ; শুধু তারাশঙ্কর নন। বালজাকও অভিজাততন্ত্রের রুচির সমর্থক ছিলেন। এঁরা জীবনসমস্যার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়েছে তার মধ্যেও কিছুটা পশ্চাদ্‌পরতা। ধনতান্ত্রিকেরা তাঁদের পুঁজির বিকাশে সবচেয়ে সহায়তা পেয়েছে বিজ্ঞানের কাছে, যন্ত্রের কাছে। কিন্তু কলকারখানায় শ্রমজীবী মানুষগুলি শুধু যন্ত্র-দাসেই পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষে মানুষে তৈরি হয়েছে একধরনের বিচ্ছিন্নতা alienation, বা এই alienation ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই অনিবার্য অভিশাপ। এই অবস্থার পরিবর্তন যদি হয় তো তা আসবে শ্রমিকদের তরফ থেকেই। কিন্তু Critical realist বা কৃষক বা শ্রমিকদের দুঃখ সহানুভূতি প্রকাশ করলেও এদের শক্তির বিস্ফোরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই যক্ষপুরীর কাওয়াল, বিশু শুধু সংখ্যা, নামহীন সংখ্যার দল, তারা রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নয়। শরৎচন্দ্রের গফুর সেই অত্যাচারিত কৃষক সে বিচারের আশায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়।

যদিও তিনি রসবস্তুকেই সাহিত্যের নিত্যবস্তু বলে ঘোষণা করে 'লোকহিত' প্রবন্ধটিতে সামাজিক দায়ভার থেকে সাহিত্যিককে মুক্তি দিয়েছিলেন। তথাপি তাঁর কিছু নাটক, কবিতা বা গল্প কিন্তু বস্তুজীবনের প্রতি তাঁর

ঔদাসীন্য প্রমাণ করে না। আসলে বাস্তবকে অস্বীকার করে কেউই সাহিত্যিক তথা মহৎ সাহিত্যিক হন না। আবার বস্তুর দর্পণ রূপেও 'সাহিত্যও' হয় না। স্রষ্টা এবং সমালোচকের পৃথক দুটি সত্তার অভিন্ন মিলন ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে স্বীকার করেও চৈতন্যের সর্বব্যাপী কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি ভাববাদীরূপে পরিচিত। তিনি সাহিত্যকে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং আনন্দদায়ক উপায় বলেই মনে করেন। সাহিত্য হল তাঁর কাছে অপ্রয়োজনের আনন্দ। অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের লাভ বা ক্ষতির কোনো সংযোগ নেই। শুধু ব্যক্তি নয়, কোনোরকম সামাজিক লাভ-ক্ষতির সঙ্গেও সাহিত্যের সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তুবাদী সাহিত্যতত্ত্বের সামাজিক উপযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র-বিরোধীরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বস্তুতন্ত্রহীনতা এবং লোকহিত সাধনে তাঁর অমনোযোগের দিকটি নিয়ে বিশদ সমালোচনা করেছেন। এই কটাক্ষপাতকে লক্ষ্য করে কবি ১৩২১ এর 'বাস্তব' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, 'উপরন্তু লোকশিক্ষার কী হইবে। সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যিকের নহে।' পরে 'লোকহিত' প্রবন্ধে এই কথাটিই আরও স্পষ্ট ভাষায় জানালে 'আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পরি না।' তথ্য ও সত্য প্রবন্ধে কবি বলেছেন, 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।' প্রকাশ বলতে তিনি প্রকাশিত সাহিত্য রূপকে বোঝাচ্ছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হল তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশিত রূপই হচ্ছে সাহিত্য। বস্তুবাদীরাও মনে করেন যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যের সংকলন মাত্র নয়। বস্তুবাদী হাওয়েলস মনে করেন, সাহিত্য জীবনের ঘটনাবলীর 'মানচিত্র' নয়, বর্ণনয় 'চিত্র'। রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদীদের এভাবে বোঝেননি। তাঁর বিশ্বাস, বস্তুবাদীরা বিশুষ্ক প্রেমহীন বাস্তব জীবনের ঘটনা রূপায়ণেই অধিক মনোযোগী। আসলে বাস্তববাদীদের সাহিত্যদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার একটি প্রধান কারণ হল, সাহিত্যের উপযোগিতার প্রশ্ন। বস্তুবাদী-সাহিত্য হল উদ্দেশ্য-প্রধান সাহিত্য একথা ধরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বাস্তব ব্যবহারের যার মূল্য নেই যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলা, রসকলায়।' কিন্তু প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে কেন সাহিত্য লেখা সম্ভব নয় ? প্রতিদিনের সংসার যার ঠাঁই সাহিত্যের ভোজে তার ঠাঁই হবে না কেন ? রবীন্দ্রনাথ তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' কে যতই sickly বই বলুন না কেন বিশ্বের তাবৎ রসিকেরা তা মানেন না। আসলে রবীবন্দ্রনাথ রোমান্টিক বলেই মনে হয়, বস্তুবাদীদের সাহিত্যদর্শনের মূলে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তুবাদী সাহিত্যে আছে যার মূল্য কম নয়। গোর্কির 'মাদার' কি উন্নত শিল্পকর্ম নয় ? তা কি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আনন্দ দেয় না ? নিশ্চয়ই দেয়, কিন্তু রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের কথা ভেবেই বস্তুবাদী সাহিত্যকে মেনে নিতে পারেননি।

১৮.৬ অবয়ববাদী সমালোচনা

সাংগঠনিক পদ্ধতির সমালোচনার একটি শাখা হল structuralism বা অবয়ববাদ। তোদেরভ বলেছেন, structural criticism বা অবয়ববাদী সমালোচনা কথাটাই স্ব-বিরোধিতায় ভরা। সমালোচকের কাজ যদি হয় কোনো রচনার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা মাত্র, স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি সেখানে ওই রচনার অন্তর্লীন সংগঠন ও নিয়মবন্ধ রূপারোপের প্রক্রিয়াটিকেই দেখিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি দেখায় যে কতকগুলি নীতি, সংগঠন, শৃঙ্খলার পারস্পরিক

যোগাযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট একটি বাঙ্‌নির্মিতির জন্ম দেয়। অর্থাৎ সাহিত্য-প্রকাশিত প্রকট রূপ এবং তার এই রূপের সামগ্রিক সংগঠনে কী করে পৌঁছানো গেছে তার প্রচ্ছন্ন সূত্রগুলিকে অধিকারকেই স্ট্রাকচারাল সমালোচনার মূল লক্ষ্য। সে অর্থে স্ট্রাকচারাল তত্ত্ব সমালোচনা নয়, সন্ধান ও আবিষ্কার। স্ট্রাকচারালিস্ট সমীক্ষক যে-রচনাটিকে নির্বাচন করেন, তার সৌন্দর্য বা সাহিত্যিক মূল সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে, তা তিনি ধরেই নিয়ে থাকেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হল, রচনাটির নানা উপাদানের নির্বাচন, বিন্যাস, সংস্থাপন ও সমন্বয়ের মধ্যে তার কোন ভিত্তি আছে কিনা তাই সন্ধান করা। তা-ই স্ট্রাকচারালিজম্‌-কে কেউ বলেছেন একটি জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের মতে, 'অবয়ববাদ' কাব্যবিচারের কোনো তত্ত্ব বা প্রণালী নয়। এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক ক্লদ লেভি স্ট্রস (Claude Levi Strauss) যিনি বলেছিলেন, কাব্য কবিতা থেকে যে নান্দনিক অনুভূতির জন্ম হয় তার মূল থাকে আবয়বিক শৃঙ্খলা। স্ট্রাকচারালিস্ট বা অবয়ববাদীরা সাহিত্য বলতে বোঝেন, ভাষার একটি বিশেষ নির্মিতি। এই 'ভাষা' কথাটিকে তাঁরা বুঝতে গিয়ে অবশ্যই বুঝে নেন, দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে কাব্যভাষার পার্থক্যের সূত্রটা কোথায় ? তাঁরা বলেন, দৈনন্দিন ভাষার লক্ষ্য হল 'জ্ঞাপন' বা জানানো এবং সাহিত্যিক ভাষার লক্ষ্য হল 'প্রকাশ'। সাহিত্যির ভাষা 'highly organized'। একজন অবয়ববাদীর কাজ ভাষার ওই Organisation-এর রহস্য বিশ্লেষণ। তাঁরা লক্ষ্য করবেন, কীভাবে ধ্বনিগত, পদগঠনগত, বাক্যগত উপাদানগুলি নির্বাচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। কোথায় তাদের মধ্যে বিরোধ, দূরত্ব বা ঐক্য এবং অংশগুলি কীভাবে গড়ে তুলছে সমগ্রকে। একজন শৈলী-বিজ্ঞানী যতটা নিরাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন অবয়ববাদী তা মনে করেন না। তাঁরা জানেন, বিষয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কখনো কখনো বিষয়কে ছাড়িয়ে ভাষা দীপ্ত হয়ে ওঠে। কবিতা বা সাহিত্যের ভাষার মূল নীতি হল ভাষার মূল সংগঠন থেকে কিছুটা সরে আসা। ভাষার মধ্যে স্বাভাবিক যে মৌলিক শৃঙ্খলা থাকে সেই শৃঙ্খলা থেকে সরে এসে পূর্ব প্রত্যাশিত নীতি-বিযুক্ত একটা স্বতন্ত্র রীতি গড়ে তোলাই কবির কাজ। অবয়ববাদী মনে করেন, কবিতা, গল্প, উপন্যাস যাই হোক তাঁর organization বা সংস্থান সংগঠনের মূল উপাদান ও নীতিকে আবিষ্কার করা তাঁদের একটা বড় কর্তব্য। structure বলতে বুঝতে হয়, আলোচ্য সাহিত্য কর্মের অনেকগুলি অঙ্গ আছে। যেমন, একটা কবিতা। কবিতাটিকে যদি বলি 'অঙ্গী' তাহলে তার দু/চার/পাঁচ যতগুলি স্তবকই থাক, সে হল অঙ্গীর অঙ্গ। অবয়ববাদীর কাজ হল অঙ্গগুলির ভিতরে পারস্পরিক সম্পর্কের যে বিন্যাস আছে তার রহস্য আবিষ্কার। আবার স্তবক রচিত হয় পঙ্‌ক্তি দিয়ে, পঙ্‌ক্তি গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। অবয়ববাদীরা কাজ স্তবকের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্‌ক্তি, শব্দ-এসবের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর থেকে সৌন্দর্যের রহস্যটি আবিষ্কার। শব্দ তো শব্দই, তার নিজের অর্থ, ইঙ্গিতদানের সামর্থ্য ইত্যাদি আছে। কিন্তু যখনই সেই শব্দ বসে অন্য শব্দের পাশে তখন একটা relation বা সম্পর্ক ঘটিত পরিচয় নতুন হয়ে দেখা দেয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ 'এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহলে' — এই তিন পঙক্তি মিলে একটা অখণ্ড ভাব প্রকাশ পেল এবং ভাবটা পাঠক মনকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিতেও সমর্থ। একথা মনে রেখেই বলা যায় 'কালের' পাশে 'কপোলতলে' যেমন Relational Identity তে বলা, তেমনটি আসত না অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে। প্রিয়ার 'কপোল' বর্ণনা করতে গিয়ে ইংরেজ কবি যে বলেছেন 'like a red red

rose' তিনি 'red' শব্দটি পরপর দু'বার ব্যবহার ভুলবশত নয়। এই দ্বিরুক্তির মধ্যেই রস-রহস্যটি লুকিয়ে আছে। শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হল - এ ধরনের পরিসংখ্যান জানিয়ে শৈলীবিজ্ঞানীর কাজ শেষ হলেও অবয়ববাদীর হয় না। তিনি সমগ্র রূপের কথাটা মনে রেখে সংগঠক উপাদান সমূহের আলোচনা করেন, খোঁজেন কীভাবে এবং কতটা রূপান্তরিত হয়েছে পুরাতন উপাদান। কবি একজন কৌশলী ব্যক্তি। তিনি ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া উপাদানগুলিকেই কৌশলে সাজিয়ে তোলেন না, সৃষ্টি ও করেন। 'উপাদান' ও 'উদ্দেশ্য' দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন যে অবয়ব, সমালোচকের কাজ তাকেই সন্ধান। সেই সন্ধান চালিয়েই তিনি লক্ষ্য করেন যে, কবিতাটির বাইরে যে গঠন তার ভিতরে গোপনে কাজ করেছে অন্য বহুগার ধরে আসা কোনো গঠন অবয়ববাদীরা কাব্যে সাংগঠনিক সমালোচনাতত্ত্বে একটি সীমা স্পর্শ করলেও প্রশ্ন উঠেছে 'অবয়ববাদের পরে কী আছে? সুতরাং সাহিত্যবিচারের এটাই শেষ কথা নয়।'

১৮.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১। প্রতিভা কয় প্রকার ও কী কী?

২। 'কারয়িত্রী' এবং 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভা কাকে বলে?

৩। 'সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়'—কে বলেছেন?

৪। সাহিত্যবিচারে শ্রেষ্ঠ উপায় কী? — বুঝিয়ে বলুন।

৫। 'ক্লাসিকাল' শব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে?

৬। দুটি ক্লাসিক আদর্শের নাম করুন।

৭। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

৮। ক্লাসিকালবিচার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করুন দুটির গ্রন্থের নাম করুন।

৯। অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের নাম কী?

১০। 'আর্স পোয়েটিকা' কার রচনা?

১১। সাহিত্য সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কী?

১২। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার পার্থক্য কোথায়?

১৩। ক্লাসিকাল সাহিত্যবিচারক হিসেবে অ্যারিস্টটলের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

১৪। অ্যারিস্টটল সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় কীসের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৫। ক্লাসিকাল সাহিত্যচর্চার সম্পর্কে হোরেসের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।

১৬। কয়েকজন নব্য-ক্লাসিক সমালোচকের নাম করুন।

১৭। নব্য-ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৮। আলেকজান্ডার পোপের গ্রন্থটির নাম কী ?

১৯। সপ্তদশ শতকের একজন নব্য-ক্লাসিক সাহিত্য বিচারকের নাম করুন।

২০। 'Parallel Between Poetry and painting' প্রবন্ধটি কার লেখা ?

২১। নব্য-ক্লাসিকেরা শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি ও বিচারের ক্ষেত্রে কোন্ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন ?

২২। রোমান্টিক আদর্শের ব্যাখ্যা করুন।

২৩। ক্লাসিকাল সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে রোমান্টিক সাহিত্য-শিল্পের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৪। রোমান্টিকেরা তাঁদের রচনার প্রেণা সংগ্রহ করেছিলেন কোন্ কোন্ উপাদান থেকে ?

২৫। 'গোথিক' কীসের প্রতীক ?

২৬। 'The Rime of the Ancient Marnier' কার লেখা ?

২৭। প্রথম রোমান্টিক নন্দন তাত্ত্বিকের নাম কী ? তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম কী ?

২৮। লঙ্গাইনাসের বক্তব্যটি সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

২৯। 'sublime' কী — ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৩০। আধুনিক রূপবাদের জনক কে ?

৩১। কান্ট 'subjective universality' বলতে কী বুঝিয়েছেন ?

৩২। রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে কান্টের দর্শনকে ব্যাখ্যা করুন।

৩৩। হেগেল আর্টকে কয়ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং কী কী ?

৩৪। 'গান' এবং 'কবিতা' কোন্ ধরনের শিল্প ?

৩৫। হেগেল 'কবিতা' কে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন আলোচনা করুন।

৩৬। রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকদের কাছে 'কল্পনার' স্থান কোথায়—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩৭। 'কল্পনা' সম্পর্কে কান্ট ও কোলারিজের বক্তব্য আলোচনা করুন।

৩৮। 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্' কার রচনা ? এই গ্রন্থের সম্পাদক কারা ?

৩৯। 'A defence of Poetry' কার লেখা ? এখানে কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে ?

৪০। কোলরিজের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থটির নাম কী ?

৪১। কাব্যভাষা সম্পর্কে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।

৪২। একটি রোমান্টিক প্রেমের কাব্যের নাম করুন।

৪৩। 'The Eve of St. Agnes' কার লেখা ?

৪৪। অবয়ববাদী সমালোচনা কাকে বলে ?

৪৫। একজন অবয়ববাদী সমালোচকের নাম করুন।

৪৬। একজন অবয়ববাদী সমালোচকের কাজ কী ? — আলোচনা করুন।

৪৭। বস্তুবাদী সাহিত্য বলতে কী বোঝেন।

৪৮। কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম করুন।

৪৯। বস্তুবাদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরুন।

৫০। 'Critical realist' কথাটি কে ব্যবহার করেছেন ? 'Critical realist' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন ?

৫১। রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী সাহিত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি কেন ?

৫২। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যকে' কীসের প্রকাশ বলে মনে করতেন ?

৫৩। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস্তববাদীদের বিরোধটা কোথায় বুঝিয়ে বলুন।

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. কাব্যতত্ত্ব; অ্যারিস্টটল; মূল গ্রীক থেকে বঙ্গানুবাদ - শিশিরকুমার দাস
2. 'Poetics' - L. Golden (translation)
3. An Essay of Dramatic Poesy - Dryden, (English Critical Texts.)
4. An Essay on Criticism - Alexander Poper (English Critical Texts.)'
5. শৈলী-বিজ্ঞান - ড. অপূর্ব কুমার রায়।
6. সাহিত্যবিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ - ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়.
7. কাব্যজিজ্ঞাসা - অতুলচন্দ্র গুপ্ত
8. A Defence of poetry - Shelley
9. Biographia Literaria - Colridge
10. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিচার; দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা
11. সাহিত্য-বিবেক - ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।
12. গঠনবাদ ও উত্তর -গঠনবাদ এবং পাচ্য কাব্যতত্ত্ব; গোপিচাঁদ নারাঙ, (বঙ্গানুবাদ) সাহিত্য এ্যাকাডেমি, নতুন দিল্লি।
13. A Reader's Guide to Contemporary Literary theory; Seldon, Widderson and Brookar; Pearson Books.